চলচ্চিত্রের বর্তমান » সংকটে এফডিসি, সংকটে বাংলা চলচ্চিত্র

সংকটে এফডিসি, সংকটে বাংলা চলচ্চিত্র

প্রিন্ট, পিডিএফ

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের বর্তমান নাজুক অবস্থা পাঠক মাত্রই ওয়াকিবহাল। দৈনিক পত্রিকাগুলোতেও হরহামেশাই আসছে চলচ্চিত্রের সংকটনির্ভর সংবাদ। কিন্তু কলমজীবীরা নিয়মিত এসব নতুন নতুন সংকট উন্মোচন করেও না সাধারণ, না সরকারের ভেতর কোনো উদ্বেগের সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছেন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের দিকে তাকালে এই নিস্পৃহতার যৌক্তিক কারণ হিসেবে এটাই বিবেচ্য হয় যে, দেশীয় চলচ্চিত্রের অবস্থান কখনই সংকটমুক্ত ছিল না; ক্রমাগত এই সংকটের সাথে পরিচিত সাধারণ মানুষ। কাজেই এটা নিয়ে উদ্বিগ্নতার কিছু নেই বলেই হয়ত তারা মনে করছে। কিন্তু এটা ভাবা কিংবা আশা করা অমূলক হবে না যে, দেশীয় চলচ্চিত্র এমন একটা অবস্থানে পৌঁছাক যেখানে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় নিজেদের আধিপত্য না হোক অন্তত টিকে থাকার সামর্থ্য অর্জন করবে। আশাবাদী আমরা হতেই পারি, কিন্তু সেই আশার যে ভিত্তি থাকা দরকার এবং যার যৌক্তিকতায় এমন স্বপ্ন সাধারণে দেখবে সেই ঢাকাই চলচ্চিত্র আমাদের কেবল হতাশাই করে না, তার সাথে জুড়ে দিচ্ছে ক্ষোভ। সর্বোপরি যখন তা প্রকাশিত হয় তখন তাকে আস্ফালনের মতোই ঠেকে। আর এই আস্ফালনের সাথে সাধারণ-নাগরিক-আকাঙ্খা আমাকে চলচ্চিত্রের বর্তমান সংকট অবস্থা এবং বিএফডিসির (বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা) ভূমিকা তলিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়েছে। লেখাটির সার্থকতাও সেখানে।

এক.

চলচ্চিত্রকে শিল্প কিংবা ব্যবসা মাধ্যম এর কোনো একটি ধারায় চিহ্নিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। সে আলোচনার সূত্রপাতও করবো না। তবে চলচ্চিত্র যে এই দুটির মিশ্রণ তা জোর গলায় বলব। ব্যবসা-সফল সিনেমা বিশ্লেষণ করলে তার উৎকর্ষতার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। কারণ চলচ্চিত্রের উদ্ভব ও বিকাশের সাথেই তার শৈল্পিক ও ব্যবসায়িক বৈশিষ্ট্য জড়িত ছিল। লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় সিনেমা তৈরির আগেই তার প্রদর্শন নিয়ে চিন্তা করেছেন। এবং প্রদর্শনে সফল হয়ে ব্যবসাও করেছেন। কিন্তু প্রায় এক শতাব্দী অতিক্রম করে চলচ্চিত্র আজ যেখানে অবস্থান করছে দেশীয় চলচ্চিত্র তার ধারে কাছেও নেই। চলচ্চিত্রের শিল্প বৈশিষ্ট্যের সাথে ব্যবসায়িক ভিত্তি কোনো যোগসূত্র স্থাপন করতে না পারার ব্যর্থতার জন্যই হয়ত এমনটি হয়েছে। যা দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ সংশ্লিষ্টদের এবং সাধারণ দর্শকদের ভেতর বোধগম্য হয়ে ওঠে নি। ফলে ব্যবসায়িক (মূলধারার সিনেমা যা এফডিসির সাথে সম্পৃক্ত) সিনেমার বিষয়বস্তু হয়েছে স্থুল যৌনতা এবং অপ্রাসঙ্গিক সংঘর্ষ। এতে করে হয়ত সাময়িকভাবে সিনেমা তৈরির খরচ উঠে আসছে কিন্তু তা ব্যবসায়িক সফলতা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে।

অন্যদিকে স্বাধীন ধারায় (বা বিকল্প ধারা; যারা এফডিসির সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়)[১] মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে কেবল চলচ্চিত্রের শৈল্পিক গুণ। ব্যবসা হয়ত তারা করছেন তবে তৈরি করতে পারছেন না একটা চলচ্চিত্রিক পরিবেশ। যেখানে সাধারণ মানুষ সিনেমা হলমুখী হবেন। ফলে দু-একটা পুরস্কার পেয়েই তাদের তৃপ্ত থাকতে হচ্ছে। সার্বিকভাবে বলতে গেলে এসবের ফলে ঢাকাই চলচ্চিত্র সম্পৃক্তদের ভেতর সৃষ্টি হয়েছে একধরনের বিচ্ছিন্নতার। বিকল্প ধারা কিংবা বিএফডিসি সংশ্লিষ্টরা কখনোই নিজেদের একটা পরিবারভূক্ত ভাবতে পারে নি, পারছে না। বিএফডিসির ক্ষেত্রে হয়ত এই পরিবারভূক্তি সহজ হতো কিন্তু তাদের লক্ষ্যও এক বিন্দুতে নির্দিষ্ট নয়। এর প্রমাণ তারা দিয়েছে তাদের কাজে ও ব্যর্থতায়।

এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবেই বলা যায় অশ্লীলতা বিরোধী আন্দোলনের কথা। যখন পরিচালক, প্রযোজক, প্রদর্শক ও শিল্পীরা অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত

করেছেন একে অপরকে। নিজেদের দায় স্বীকার করেন নি। অশ্লীলতা বিরোধী আন্দোলনের যৌক্তিকতা কিংবা কার্যকরণ নিয়ে কোন কথা বলতে চাই না। তবে এটা যে চলচ্চিত্রের কোনো মঙ্গল বয়ে আনে নি তার সব থেকে বড় প্রমাণ চলচ্চিত্রের বর্তমান সংকটাপন্ন পরিস্থিতি। সাধারণ মানুষ সিনেমা হলের সাথে একরকম সম্পর্ক চুকিয়েই বসে আছেন। আর সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখার রূপকথার গল্প শুনে বেড়ে উঠছে বর্তমান প্রজন্ম। সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখার ক্ষেত্রে যে নেতিবাচক ধারণায় তারা বুদ হয়ে আছেন তাতে চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের যেমন দায় আছে তেমনি সরকার কিংবা বর্তমানের বিভিন্ন ধারার গণমাধ্যম এর বাইরে নয়। এর ফল হিসেবে ক্ষতি হচ্ছে দেশের চলচ্চিত্রের। সংকট কাটছে না। চলচ্চিত্রের এই নাজুক পরিবেশ সৃষ্টিতে সম্ভবত এফডিসিই সব থেকে বেশি দায়ী। কারণ দেশীয় চলচ্চিত্রের উদ্ভব ও বিকাশের, সর্বোপরি অধঃপতনের সাথে এর রয়েছে নাড়ি ছেঁড়া সম্পর্ক।

দুই

ইদানীং চলচ্চিত্রের প্রাণকেন্দ্র এফডিসিতে ছবির চিত্রায়ণ হতে দেখা যায় খুব কম। গত কয়েক মাস ধরে এখানে নির্মাতারা কাজ করার বিষয়ে খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এফডিসির কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কারণে বিভিন্ন শাখা এখন প্রায় অচল। বিশেষ করে সম্পাদনা শাখা, শব্দগ্রহণ বিভাগ, ক্যামেরা শাখা সবই একপ্রকার অচল হয়ে আছে।[২]

এফডিসি একটা গোডাউন হয়ে গেছে। ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন না হয়ে, হয়েছে ফেইলর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। এফডিসিতে কিছু নেই। - চাষী নজরুল ইসলাম[৩]

দেশীয় চলচ্চিত্রের সার্বিক উন্নতির কথা বিবেচনা করেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে ইস্ট পাকিস্তান ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ইপিএফডিসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর এর নাম হয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা সংক্ষেপে বিএফডিসি বা এফডিসি। হঠাৎ হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো দু-একটি সিনেমার কথা বাদ দিলে এফডিসি নির্মিত সিনেমা তার জন্মের পর থেকেই হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে। মেরুদণ্ড সোজা করে তুলে ধরতে চলচ্চিত্র নির্মাণে টাকা ছড়িয়েছেন অনেকেই। তবে সেটা যে কেবল স্বার্থ আচরণ ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না কিংবা কোন রকম দূরদর্শিতা ছাড়াই ঝোঁকের মাথায় তারা টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন তার প্রমাণ পরবর্তীতে তাদের প্রস্থান। সংকটের এক পর্যায়ে নব্য-ধনী, নায়ক-নায়িকা, কালো টাকার মালিকদের উত্তরসূরি হিসেবে প্রযোজনা মঞ্চে আবির্ভাব বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোর। এরা সিনেমা নির্মাণ করছে নামেমাত্র। তাদের মূল উদ্দেশ্যই থেকে গেছে ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের মাধ্যমে লগ্নিকৃত টাকা তুলে আনা। যেখানে তাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ করছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। চলচ্চিত্রকে বাঁচাবার অজুহাতে তারা পণ্য বিক্রি করছে। আর উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা প্রকাশে লোক দেখানো দু-একটি সিনেমা হলে করছে তার প্রদর্শন।

স্বাধীনতার ৪০ বছর এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রায় ৫২ বছর অতিক্রম করছে এফডিসি। এই পথ পরিক্রমায় এফডিসি কখনোই সংকটমুক্ত ছিল না। একবিংশ শতকের শূন্য দশক অতিক্রমের পর তার অবস্থা আরও নাজুক। সার্বিক এই সংকটের জন্য এফডিসি অন্তর্ভূক্ত প্রায় সকল শাখাই কম-বেশি দায়ী। চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট অনেকেই এফডিসি নিয়ে তাদের উদ্বেগের কথা বলছেন। তাদের উদ্বেগ মিশ্রিত বাক্যালাপ স্থান করে নিচ্ছে প্রতিদিনের সংবাদপত্রে। কিন্তু এ যেন আলিবাবা ও চল্লিশ চোরের সেই যাদুর গুহা। নির্দিষ্ট সেই মন্ত্র মনে করতে পারছেন না কেউ, তাই খুলছে না গুহার দ্বার। খুলছে না এফডিসির সামগ্রিক জটলা।

সার্বিক এই সংকট সমাধানে বর্তমানে প্রয়োজন সৃজনশীল মস্তিষ্কের পাশাপাশি তার যথাযথ সংগঠন। আর সাংগঠনিক অবস্থান পোক্ত করতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই কিছু দিন আগে এগিয়ে এসেছিলেন অভিনেতা রাজ্জাক, সোহেল রানা ও উজ্জ্বল। গত মার্চের শেষে তারা চলচ্চিত্রকে সংকটমুক্ত করার ইচ্ছায় চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিবেশক ও শিল্পীদের একত্রিত হয়ে কাজ করার জন্য মতবিনিময় সভা ডাকেন। কিন্তু তারা এ থেকে কোনো ইতিবাচক ফল আনতে ব্যর্থ হন। সভা স্বার্থক হলেই যে চলচ্চিত্রের সার্বিক সংকটমুক্তি ঘটতো এমনটি ভাবা ঠিক নয়। তবে শুরুতো হতে পারত। সে যাই হোক চলচ্চিত্র শিল্পকে ঘটা করে সংকটমুক্ত করার যে খায়েশ তারা করেছিলেন, সেই মনোবাঞ্চা অপূর্ণই থেকে গেলো। ফিরে গেলেন তারা।

তিন.

... আমাদের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির অভাব। দর্শকের সামনে এখন অবারিত আকাশ সংস্কৃতি। আমাদের কাজগুলো উপযুক্ত মানের না হলে দর্শক দেখবে না। - গাজী মাজহারুল আনোয়ার[৪]

... এফডিসি প্রায় অচল হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ক্যামেরা না পেয়ে অনেকেই শুটিং করতে পারছেন না। ...অন্যদিকে অনেকের ছবির শুটিং শেষ হলেও ডাবিং থিয়েটারের মেশিনপত্র নষ্ট হয়ে থাকার কারণে কেউ কেউ ডাবিং করতে পারছেন না।[৫]

চলচ্চিত্র প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প মাধ্যম। প্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশকে সাথে নিয়ে পাশ্চাত্য এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত অনেক এগিয়ে গেছে। অথচ ঢাকাই চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি এখনো পড়ে আছে মান্ধাতার আমলের যান্ত্রিক কলাকৌশল নিয়ে। আধুনিক যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা (নাই বললেই চলে) চলচ্চিত্রের একেবারেই প্রাথমিক সমস্যা। তবু সেই সমস্যার সমাধান কীভাবে হতে পারে তা জানা নেই কারো। পরিচালকদের হা-হুতাশে কান খাড়া করলে স্পষ্টতই শুনতে পাই, আধুনিক প্রযুক্তি থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে; এফডিসিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই। নির্মাতা *তারেক মাসুদ* এর একটি লেখা থেকে উদ্ধৃতি করছি, কেবল চলচ্চিত্রে নয় সকল শিল্পমাধ্যমে ডিজিটাল টেকনোলজির ব্যবহার অনিবার্য হয়ে পড়েছে।... চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে শব্দগ্রহণ, শব্দমিশ্রণ, সম্পাদনা, প্রজেকশন এমনকি চিত্রগ্রহণ পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে ডিজিটাল অপশন ব্যবহার করা হচ্ছে। যে দেশে একটা মানসম্পন্ন ফিল্ম ল্যাব নেই, একটি কার্যকর অ্যানালগ শব্দগ্রহণ ও মিশ্রণ স্টুডিও নেই, যেখানে মেয়াদোত্তীর্ণ ফিল্ম স্টক নিয়ে শুটিং করতে হয়, অন লোকেশন সাউন্ড শুট করার ক্যামেরা ও শব্দযন্ত্র নেই সেখানে কম্পিউটার কৃৎ-কৌশল মাধ্যমেই বিগ লিপ দেয়া সম্ভব। আমরা যদি এক্ষেত্রে বেশি শ্লথ গতিতে এগোই, সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, ভূটান মালদ্বীপ আমাদের আগেই বিশ্ব-চলচ্চিত্রের মানচিত্রে বড় জায়গা করে নেবে।[৬]

পাশ্চাত্য কিংবা ভারতে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই নির্মাতারা ডিজিটাল প্রযুক্তিতে কাজ করছেন। সিনেমা হল ডিজিটালাইজড না হবার কারণে নির্মাতারা পরে তা রূপান্তর করতেন ফিল্ম মাধ্যমে। এতে যেমন খরচ বেড়ে যেত ঠিক তেমনি ইমেজের দৃশ্যগত গুণমান কমে যেত। পরবর্তী সময়ে হার্ডডিস্কে সংরক্ষিত ইমেজকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রক্ষেপণ করা সম্ভব হয়ে উঠলে ইমেজের দৃশ্যগত গুণমানেরও উন্নতি ঘটে। বিগত কয়েক বছরে প্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশ ডিজিটাল পদ্ধতিকে সহজলভ্য ও গুণগত মানের বিচারে অনেক দূর নিয়ে গেছে। নতুন এই প্রাযুক্তিক দক্ষতা অর্জন না করতে পারলে সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্প। দেশে বর্তমানে অনেক নির্মাতাই কাজ করছেন এ পদ্ধতিতে। কিন্তু প্রদর্শন সুবিধা না থাকায় বাধ্য হচ্ছেন ৩৫ মি.মি. এ ট্রান্সফার করতে। ফলে নির্মাণ ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। ব্যবসায়িক ক্ষতির মুখে পড়ছেন তারা।

ডিজিটাল প্রযুক্তির অপরিহার্যতা সত্ত্বেও এফডিসি এ ব্যাপারে আগের মতোই নীরব। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে নির্বাচিত সরকার কেবল ঝুলিয়ে রেখেছে ডিজিটাল সিনেমা হল নির্মাণ কার্যক্রম। জেলায় জেলায় ডিজিটাল সিনেমা হল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের সূচনা হয়েছে এমন খবর চোখে পড়ছে না। যোগ্য উত্তরসূরী হওয়ার ইচ্ছায় হয়তবা তাদের এই হাত গুটিয়ে বসে থাকা! পূর্বসূরী বিগত চারদলীয় জোট সরকার, ডলবি ডিজিটাল সাউন্ড কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিল। মাঝে চলচ্চিত্র-বন্ধু তত্ত্বাবধায়ক সরকার (কেননা তাদের অশ্লীলতা বিরোধী অভিযান তো তাই বলে!) এবং বর্তমান সরকার প্রায় তিন বছর অতিক্রম করলেও কেবলই ভবন হয়েছে, চালু হয়নি সাউন্ড কমপ্লেক্স। নতুন মেশিনপত্র কেনা হলেও তা নিম্নমানের। টেলিসিনে৭ মেশিন চালু হওয়ার আগেই নষ্ট হয়েছে, কাজ করছে না এর অপটিক্যাল ক্যামেরা। বেশ কিছু যন্ত্রাংশও পুরানো। সব মিলে অকার্যকর হয়ে পড়ে আছে ডলবি ডিজিটাল সাউন্ড কমপ্লেক্স। নাজির আহমেদ সাউন্ড কমপ্লেক্সে কিংবা বিপুল অঙ্কের টাকা ব্যয় করে নির্মিত মান্না ডিজিটাল সাউন্ড কমপ্লেক্সে আশানুরূপ কাজ করতে পারছেন না নির্মাতারা। এর ভেতর নাজির আহমেদ সাউন্ড কমপ্লেক্সে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বড় পর্দার জন্য ডাবিং করা যায় না, আর মান্না ডিজিটাল সাউন্ড কমপ্লেক্সতো চালুই হয় নি।

এছাড়া দীর্ঘদিন অকেজো হয়ে পড়ে আছে রক এন রোলের দুটি ডাবিং মেশিন। সব থেকে উদ্বেগের কথা, যে সকল আধুনিক যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে সেগুলো পরিচালিত করার মতো দক্ষ লোক বাংলাদেশে নেই। ফলে যা আমদানি করা হচ্ছে তাও প্রায় অব্যবহৃত থেকে থেকে শেষ অবধি অকেজো হয়ে পড়ছে। অনেক নির্মাতা (যাদের নির্মাণ ব্যয় তুলানামূলক বেশি) ভরসা হারিয়ে ফেলেছেন এফডিসির ওপর থেকে। ভালো কাজের আশায় তারা ভাড়া করে আনছেন বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি। সিনেমার পরিস্ফুটণ, মুদ্রণ, শব্দগ্রহণ এমনকি সম্পাদনার কাজ করতে ছুটে যাচ্ছেন ভারতের কোনো ল্যাবে।

চার.

এফডিসির কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কারণে বিভিন্ন শাখা এখন প্রায় অচল।... নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিতে পারছেন না।[৮]

দুর্নীতি বাংলাদেশে কোনো খবর নয়। দেশ দুর্নীতিতে পরপর দুবার শীর্ষে অবস্থান করে তা প্রমাণ করেছে। যেখানে দেশের প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠান দুর্নীতির ভেতর অবস্থান করছে সেখানে এফডিসি তার ব্যতিক্রম হবে কেন? এখন কথা হল এফডিসি সৃষ্টির মূল লক্ষ্যই ছিল চলচ্চিত্রের সার্বিক উন্নয়ন। এফডিসি এ্যাক্টের ২৪ ধারায় সংস্থার কার্যাবলী সুনির্দিষ্ট করা আছে। এতে বলা আছে, চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে সাহায্য দানের জন্য এফডিসি যে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন বলে মনে করে সে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়া, প্রদর্শন, আধুনিক প্রযুক্তির আমদানি নিশ্চিত করা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ যাবতীয় কাজ এফডিসি-এ্যাক্ট বাস্তবায়নে তালিকাভুক্ত। কিন্তু এফডিসি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ভুলে বসে আছেন সংশ্লিষ্টরা। এ্যাক্টে কী আছে না আছে, সে দিকে দৃষ্টি নেই কারো। আর এ কারণেই স্বাধীনতা উত্তর প্রাদেশিক পরিষদে এফডিসিকে অবিহিত করা হয় ফেয়ার ডিপো অব করাপশন বলে ।[৯] স্বধীনতার পর থেকে এফডিসির দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছেন একের পর এক ক্ষমতাসীন সরকার। কিন্তু ওই উদ্বিগ্নতা পর্যন্তই। কেননা দুর্নীতি কিংবা সার্বিক অব্যবস্থাপনার সাথে সরকার মদদপুষ্ট লোকজনরাই ছিলেন। সরকার পরিবর্তন হয়েছে দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদেরও পালাবদল হয়েছে। তাই সাধারণের কাছে এটা এখন স্বাভাবিক বলেই বিবেচিত হচ্ছে।

অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বিষয় নির্দিষ্টের বিশেষজ্ঞ কিংবা চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথে জড়িত না থাকার দরুন প্রশাসনিক যোগ্যতার প্রশ্নেও অদক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন। সংকটের কারণ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে কোনো চেষ্টা তাদের নেই। অবশ্য না থাকাটাই

স্বভাবিক! আর সাথে আছে সরকারের স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা। নতুন সরকার আসছেন, পূর্বসুরীদের অনাবৃত করার ইচ্ছে থাকলেও নিজেরা সেই একই কাজ করে যাচ্ছেন। মেয়াদ শেষে গুছিয়ে নিচ্ছেন নিজেদের আখের। ব্যক্তিক স্বার্থ পূরণ হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সমগ্রের যে এফডিসি ক্ষতি হচ্ছে তার। দুর্নীতি পরায়ণ কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে, তবে কেঁচো খুড়তে যেন সাপ না বের হয় সেটাও মাথায় রাখছে কর্তৃপক্ষ। আর সেটা হলে এফডিসির অস্থিরতা চরমে উঠবে বলে ধারণাও করছেন অনেকে। সমপ্রতি যখন কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তখন হঠাৎ করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে এফডিসিতে[১০]।

পাঁচ.

...বিশ্বকাপ ক্রিকেট ছাড়াও চলচ্চিত্রের আরও অনেক সংকট রয়েছে। মাসে এখন ছয়টি ছবিও মুক্তি পায় না। - কে এম আর মঞ্জুর[১১]

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের জন্য দুই মাস নতুন ছবি মুক্তি বন্ধ।...প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা চলচ্চিত্রের পাশাপাশি ক্রিকেট খেলা দেখানোর পরিকল্পনা করেছেন।[১২]

দর্শক পাচ্ছেন না প্রদর্শকরা। ব্যবসা হচ্ছে না বিধায় ভেঙে ফেলছেন সিনেমা হল। তার জায়গায় গড়ে উঠছে সুনিশ্চিত ব্যবসার অবাধ ক্ষেত্র শপিং মল; কখনও কখনও আকাশচুম্বি এ্যাপার্টমেন্ট। সিনেমা হল কমছে, কমছে ছবি মুক্তির হার। এর পেছনের কারণ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রদর্শক আর চলচ্চিত্র নির্মাণ সংশ্লিষ্টদের মতের মিল প্রথমবারের মতো হলেও আছে। তারা মনে করছেন, দর্শক আগের তুলনায় সিনেমা কম দেখার কারণেই এই সংকটের সৃষ্টি। সংকট চিত্রণে তাদের এই মতামতকে আংশিক ঠিক বলে মনে হয়। দর্শক সিনেমা কম দেখছে ঠিকই কিন্তু সেটা কেবল দেশীয় চলচ্চিত্রের হিসেবে। বলিউড, হলিউড, টালিগঞ্জ কিংবা দক্ষিণের সিনেমার একটা বৃহৎ বাজার দেশে গড়ে উঠেছে। দর্শক বেশি সিনেমা না দেখলে এই ব্যবসাটা দিন দিন বাড়ার কথা নয়। দেশীয় সিনেমার সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকতে না পারার দরুন তার ব্যবসার কলেবর কমে যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে চলচ্চিত্র ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্টরা। স্বাভাবিকভাবেই কমে যাচ্ছে সিনেমা নির্মাণের হার। গত ফেব্রুয়ারি-মার্চেই বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সময়ে ব্যবসা না করতে পারার আশংকায় কোনো ছবি মুক্তি দেয় নি প্রযোজকরা। বিপাকে পড়েছিলেন হল মালিকরা। সেই সময় তাদের ভরসা করতে হয়েছে পুরোনো ছবির ওপর। এমনকি কোনো কোনো হল মালিক সিনেমা না চালিয়ে বিশ্বকাপ খেলা পর্যন্ত চালিয়েছেন।

অন্যদিকে স্যাটেলাইট প্রযুক্তির সহজলভ্যতা সাধারণের মধ্যে সৃষ্টি করেছে হিন্দি ও পাশ্চাত্য সিনেমার প্রতি তীব্র আসক্তি। অতি-কাল্পনিক, সংঘর্ষপূর্ণ কিংবা ইতিহাসনির্ভর এইসব সিনেমায় খরচ করা হয় বিপুল অর্থ। সাথে আছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। প্রাযুক্তিক সুবিধাতে আর মাধ্যম সৃষ্ট জনপ্রিয়তার বিচারে সেই সব সিনেমা দর্শকের চোখে লেগে থাকছে। আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব আর মেধাহীন মস্তিষ্কের নির্মিত দেশীয় সিনেমা প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছে বিদেশী ওইসব সিনেমার সাথে (যদিও দেশীয় সিনেমার সে সাহস নেই)। আর ভিন্ন ভাষার সিনেমার প্রতি যাদের অনাগ্রহ তাদের কাছে হাত মেলে আছে ভারতের টালিগঞ্জ নির্মিত সিনেমা। ব্যবসায়িক কিংবা শৈল্পিক উৎকর্ষতার বিচারে এই সিনেমাগুলো বলিউডের দুর্দান্ত প্রতাপ রুখছে। বলিউড কিংবা পাশ্চাত্য চলচ্চিত্রের ব্যবসায়িক রাজত্বে এরা ঢুকে পড়ছে জলদস্যুর মতো। তৈরি করছে নিজেদের চলচ্চিত্রিক বলয়।

দেশীয় চলচ্চিত্রের প্রতি সাধারণের এই বোধ একদিনে তৈরি হয় নি। ক্রমাগত স্টেরিওটাইপ কাহিনীর দেশীয় সিনেমা দর্শককে আগ্রহান্বিত করতে পারে নি। এক্ষেত্রে তারা চিহ্নিত করছেন চিত্রনাট্যের দুর্বলতা, নকলের প্রবণতা, আর গতানুগতিকতার সাথে দুর্বল মেকিং এর অবশ্য কারণ।

ছয়.

চলচ্চিত্রে এখন আমি একাই রাজা-বাদশা। আলোচনা সমালোচনা তো আমাকে নিয়েই হবে। চলচ্চিত্রকে আমি এখন একাই টেনে নিয়ে যাচ্ছি। আমাকে তো একটু ছাড় দিতেই হবে।- শাকিব খান[১৩]

১ এপ্রিল *এক টাকার দেনমোহর* ছবির শুটিংয়ে ১০ দিনের জন্য ব্যাংকক যান শকিব-অপু। এই দশ দিন এফডিসিতে কোন ছবির শুটিং হয়নি।[১৪]

ছবি নির্মাণে হাত দেবার পূর্বে নির্মাতা চিত্রনাট্যে মনযোগী হবেন। ভাববেন চরিত্র নিয়ে। অনেকগুলো বিকল্পের ভেতর থেকে সবচেয়ে যোগ্য অভিনেতাকে বেছে নেবেন। আবার কখনও কোনো বিশেষ চরিত্রে বিশেষ কোনো অভিনেতাকে আগে থেকেই ভেবে রাখা হয়। কিন্তু ঢাকাই চলচ্চিত্রের দিকে তাকালে বরং এর উল্টোটাই চোখে পড়ে। পরিচালক ছুটছেন তারকা শিল্পীর পেছনে। চিত্রনাট্য দূরে থাক, অন্য শিল্পীদের কথাও ভাবতে পারছেন না নির্মাতারা। বিকল্প সৃষ্টি না করতে পারার দরুন সব পরিচালকের দৌড় শেষ হচ্ছে একজন বিশেষ শিল্পীর দরজায়। এর ফলে সেই বিশেষ শিল্পী নিজে হয়ে পড়ছেন উদ্ধত। ফলে বিপর্যস্ত হচ্ছে চলচ্চিত্র।

শূন্য দশক পেরিয়ে এসে দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পীসংকট থেকে বেরুতে পারে নি। একক শিল্পী নির্ভরতায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র এর আগেও মুখিয়ে ছিল বেশ কয়েকবার। সালমান শাহ্ ও মান্নার মৃত্যু পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্রকে অতিক্রম করতে হয়েছে দুর্বিষহ সময়। বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন লগ্নিকৃত প্রযোজকরা। সেই নির্ভরতা এখনো আছে। কোনো নির্দিষ্ট শিল্পীর অনুপস্থিতি বা ব্যস্ততায় বসে থাকতে হয় এফডিসিকে।

চলচ্চিত্রে তারকা নির্ভরতা থাকতে পারে, তবে তার সীমা টেনে রাখা উচিত। সৃষ্টিশীল শিল্প চলচ্চিত্র; তাই কোনো তারকার ওপর তার নির্ভরতা বেমানান। কারণ চলচ্চিত্র নিজেই নির্মাণ করবে নতুন নতুন তারকা। আর তারকার প্রশ্নই হয়ত দূরে চলে যাবে যখন সবদিক থেকে চলচ্চিত্রের সার্বিক মানের উন্নতি ঘটবে এবং দেশীয় ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হবে। সের্গেই আইজেনস্টাইন, সত্যজিৎ রায়সহ যে নির্মাতারা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন তাদের বেশিরভাগ সিনেমায় কিন্তু কোনো তারকা অভিনেতা ছিল না। বরং তাদের সিনেমায় অভিনয় করে অনেকে তারকা হয়েছেন। ইতিহাস দূরে থাক, টালিগঞ্জের এখনকার ভিন্ন ধারার সিনেমাগুলোর দিকে তাকালেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। শৈল্পিক মানে উত্তীর্ণ এসব চলচ্চিত্রে নেই তেমন কোনো তারকা। সেগুলোও কিন্তু কম ব্যবসা করছে না। তাই বলছি শিল্পী সংকটের ধূয়ো তুলে দেশীয়-নির্মাতারা আর কত নিজেদের উর্বর-মস্তিষ্ক না খাটিয়ে বরং নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টা করবেন !

চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বরাবরই দর্শক দ্বারা তাড়িত হয়েছেন। দর্শক যা চেয়েছে তাই করতে চেয়েছেন। নিজেদের সৃষ্টিশীল মনন দিয়ে দর্শকদের রুচিবোধের উন্নতিও যে পরোক্ষভাবে করা যায় তা তারা কখনও করেন নি। কিংবা বলা যায় করতে পারেন নি। ফলে দর্শক কোনো বিশেষ অভিনেতাকে পছন্দ করতে শুরু করলে পরিচালকরা তাকে নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। এতে সার্বিকভাবে চলচ্চিত্রের মান গেছে কমে। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে চলচ্চিত্র শিল্প। আর সেই সব তারকা নিজেদের মনে করেছেন এফডিসির একচ্ছত্র রাজা-বাদশা।

একথা জোর দিয়ে বলা যায়, চলচ্চিত্রের বর্তমান শিল্পী সংকটের পেছনে দায়ী নির্মাতারা। অন্যদিকে নির্মাতাদের বিকল্প কাজে উৎসাহিত করতে সেই সব প্রযোজকদের প্রয়োজন যারা এক্সপেরিমেন্টাল ছবি নির্মাণে অর্থ লগ্নি করবেন।[১৫]

সাত.

অশ্লীলতা ও ভিডিও পাইরেসি প্রতিরোধ বিষয়ক টাস্কফোর্স ইতিমধ্যে প্রায় ৪০০ বাংলা সিনেমাকে কালো তালিকাভূক্ত করেছে। বিগত তত্বাবধায়ক সরকার আমলেই এসব চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হয়। তবে এখনো গোপনে অভিযুক্ত সিনেমার প্রদর্শনী চলছে।[১৬]

পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। দোষীদের সাত থেকে ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং পাঁচ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।[১৭]

সমাজে বিদ্যমান শ্লীল ও অশ্লীল এর ধারণা শাসক শ্রেণীর ভাবনা প্রসূত। তাদের মতাদর্শেই বিবেচিত হয় সাধারণ জনগণ কোনটাকে অশ্লীল বলবে। এর ব্যতিক্রম নেই ঢাকাই চলচ্চিত্রেও। চলচ্চিত্রে অশ্লীল দৃশ্য চিহ্নিত ও তার প্রদর্শন নিষিদ্ধ করার মহান ব্রত সেন্সর বোর্ডের; কখনও কখনও দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্টেটের। সেন্সর বোর্ড সদস্য কিংবা কর্ম-উদ্যোমী ম্যাজিস্টেটদের কাছে মুনমুন, ময়ুরী, পলিদের স্থুল দেহ, দৃষ্টিতে আহ্বান অশ্লীল হলেও ক্যাটরিনা কাইফ, মালাইকা অরোরা খান কিংবা মল্লিকা শেরওয়াতের যৌন অভিব্যক্তি আর তন্বী-দেহ এমনকি শয্যা দৃশ্যেও চরম শৈল্পিক। দেশের একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে মুনমুন, ময়ুরীই কিন্তু ভরসা। দর্শক যখন হলবিমুখ, নির্মাতারা যখন মেধাহীন তখন একটা বিপুল দর্শককে এই স্থুল দেহের অধিকারীনিরাই হলে নিয়ে এসেছেন। সচল রেখেছেন খুঁড়িয়ে চলা চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিকে। অথচ এই সাধারণ নিম্নবর্গীয় দর্শকদের রুচি কিংবা আগ্রহের কোনো দাম অশ্লীলতা নিধন সংশ্লিষ্টরা দেননি।

দেশে অশ্লীলতা বিরোধী অভিযানের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু ২০০৭ সালে। মধ্যবিত্ত আবেগ তাড়িত বিগত তত্বাবধায়ক সরকার উঠে পড়ে লাগেন অশ্লীল ছবির বিরুদ্ধে। বন্ধও হয়ে যায় সেই সময়। পরে মূলে পানি পেয়ে আবারো বেড়ে ওঠে অশ্লীল ছবির নির্মাণ। আর তার ফলে প্রায় প্রতিদিনের সংবাদপত্রে স্থান করে নিতে থাকে অশ্লীলতা বিরোধী অভিযানের কথা।

এদিকে গত মে মাসে বর্তমান সরকার অনুমোদন করেন পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া। পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা কিংবা এর সম্ভাব্যতা বিষয়ে বলার কিছু নেই। তবে পর্নোগ্রাফি বিশেষ করে চলচ্চিত্রে কাটপিস (অননুমোদিত ক্লিপস যা পরে মূল ছবিতে সংযোজিত হয়) কেন এলো এবং কেনই বা তা অদম্য? সে বিষয়ে কিছু বলতে চাই। আর আশা করছি এই আলোচনা পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা এবং তার সম্ভাব্যতাকেও সুনির্দিষ্ট অবস্থানে নিয়ে যাবে।

শিল্পের বাইরেও চলচ্চিত্রের সাথে ব্যবসা ও মুনাফা জড়িত। তাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়া এই শিল্প ইন্ডাস্ট্রি থেকে লগ্নিকৃত অর্থ তুলে আনতে এক পর্যায়ে যোগ হয় অতিরিক্ত যৌনতা ও সহিংসতা। নির্মাতারা দর্শক আকর্ষণে সৃজনশীলতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েই আঁকড়ে ধরেন সস্তা যৌন দৃশ্য এবং সহিংসতার চিত্রায়ণ। এতে করে আর যাই হোক, অন্তত লগ্নিকৃত টাকা উঠে আসত। বাংলা চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা তাই সমস্যা নয় বরং বলা যায় ক্রমাগত ব্যর্থতা আর সৃজনশীলহীনতারই ফলাফল মাত্র।[১৮]

এফডিসির ভেতরেই বেশিরভাগ অশ্লীল দৃশ্য বা কাটপিস ধারণ করা হচ্ছে, গড়ে ওঠেছে কিছু পরিচালককেন্দ্রিক সিন্ডিকেট।[১৯] এই দৃশ্যগুলোতে যারা কাজ করছেন তাদের অনেকেই নায়িকা হবার স্বপ্ন নিয়ে এখানে এসেছিলেন। এদের মধ্যে নিম্নবিত্ত কিংবা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরাই বেশি। আবার অনেকে এসেছেন পূর্ব সম্পর্কের জের ধরে। তারা আসছেন, হতাশ হচ্ছেন সর্বোপরি হচ্ছেন প্রতারিত। আবেগী সম্পর্কের একান্ত মুহূর্তের স্থিরচিত্র কিংবা ভিডিও ক্লিপস ব্যবহার করা হচ্ছে এই প্রতারণায়। ভূক্তোভোগীরা সমাজে মান-সম্মান নষ্ট হয়ে যাবার আশংকায় পরে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন পর্নোগ্রাফিতে। ফিরে আসার পথ বন্ধ, বিপরীতে অন্তত টাকাতো পাওয়া যাচ্ছে।

আট.

র‍্যাব-৩-এর নেতৃত্বে এক অভিযানে পাইরেসির অভিযোগে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে লক্ষাধিক পাইরেটেড সিডি উদ্ধার করা হয়।[২০]

সামনে আমার ছবি মুক্তি পাবে। ছবি নির্মাণে খরচ করেছি ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এখন মুক্তি দেওয়ার আগে যদি ভিডিও পাইরেসি বন্ধ না হয়, তাহলে ছবি মুক্তি দেব না নয়ত পাইরেসির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের চাহিদামতো চাঁদা দিয়ে আপস করতে হবে।[২১]

প্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশ চলচ্চিত্রকে (নির্মাণ, প্রদর্শনসহ অন্যান্য যান্ত্রিক সহজলভ্যতার বিচারে) আগের যেকোন সময়ের তুলনায় সহজ করেছে। প্রাযুক্তিক সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে নির্মাতার যেমন ব্যয় কমছে, ঠিক তেমনি নির্মাণেও দিচ্ছে পরীক্ষালব্ধ চিন্তা প্রকাশের নিশ্চয়তা। আবার বিপরীতক্রমে কিছু দুর্বৃত্ত এই প্রযুক্তিরই অপব্যবহার করে একে ঠেলে দিচ্ছে ধ্বংসের দিকে। আর সেটা হলো ভিডিও পাইরেসি। পুরো চলচ্চিত্র শিল্প এখন পাইরেসির কবলে। সিনেমা থেকে যা আয় হবার তা কেবল ঋণাত্মকের ঘরেই থেকে যাচ্ছে। দেশীয় চলচ্চিত্রের বাজার এতটা বৃহৎ নয় যে, এই লোকসান পুষিয়ে ফেলতে পারবে। যেমনটা পারছে মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রি। সেখানে শতকরা আয়ের ৩০ থেকে ৪০ ভাগ তারা পাইরেসির কারণে হারায়।[২২] তারপরও বৃহৎ বাজারের জোরে নিট মুনাফা ধনাত্মকই থাকছে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যা একেবারেই অসম্ভব।

সব প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে একসময় প্রযোজকের হাতে আসছে নতুন ছবি। যেখানে তার ভাববার কথা নতুন সিনেমাটি ব্যবসা

করবে কি-করবে না, কতগুলো সিনেমা হলে তার মুক্তি দেয়া হবে, পরবর্তী সিনেমার কাজ কবে হাতে নেবেন; এসব চিন্তা করার আগেই তাকে আতঙ্কিত হতে হচ্ছে। আর এই আতঙ্কের কারণ পাইরেসি। ভিডিও পাইরেসি করতে ওঁৎ পেতে আছে একদল দুর্বৃত্ত। যারা টেকনো দক্ষ এবং অনেকটা বিকারগ্রস্থ। এদের কারণে কখনও কখনও প্রযোজকরা ছবি মুক্তির তারিখ পেছাতে বাধ্য হচ্ছেন; কখনও মেনে নিচ্ছেন পাইরেসি সিন্ডিকেটের দাবী।

ভিডিও পাইরেসি রোধে সরকারের বাইরে এফডিসির বড় ভূমিকা নেবার কথা থাকলেও তারা তা পারছেন না (কেবল আইন প্রণয়ন, পাইরেসি সমস্যার সমাধান নয়)। উল্টো অনেক ক্ষেত্রে এফডিসি সংশ্লিষ্টরাই জড়িয়ে পড়ছেন ভিডিও পাইরেসির সাথে।

নয়.

চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আন্দোলনের মুখে সরকার ভারতীয় ছবি আমদানি নিষিদ্ধ করে। ১৭ জুন প্রণীত নতুন আমদানি নীতিমালায় উপমহাদেশের ছবি দেশে আমদানির বিষয়টি আবারও নিষিদ্ধ করা হয়।২[৩]

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নতুন করে উপমহাদেশের ছবি আমদানির বিধানটি বাতিল করার বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করে প্রেক্ষাগৃহের মালিকেরা উচ্চ আদালতে রিট দায়ের করেছেন।২[৪]

অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত প্রায় ৪০০ ছবি। পাইরেসি আতঙ্ক, দ^৫

1
Like
1
Share
Tweet 0